যশোদা মায়ী পূজিত দুর্গার পট

স্বামী ধ্রুবেশানন্দ

দুর্গাপূজা সনাতন হিন্দুধর্মের এক প্রাচীন পরম্পরা। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে দুর্গাপূজা শুরু করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই। মঠ-মিশনের দুর্গাপূজার সঙ্গে কুমারীপূজারও দীর্ঘদিনের এক সংযুক্তি ঘটে গেছে। এটিও সনাতন ধর্মের আর একটি ঐতিহ্য। জম্মুর বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে এখনও প্রতিদিন তিনটি বালিকাকে মাতৃজ্ঞানে কুমারীপূজা করা হয়। মঠ-মিশনের সূচনাতে বরানগরের সেই ভাঙাবাড়িতেও স্বামীজী পটে দুর্গাপূজা করেছিলেন। বেলুড় মঠে প্রথমবার প্রতিমায় দুর্গাপূজার সময় স্বামীজীর উপস্থিতিতেই কুমারীপূজা হয়। স্বামীজী তাঁর পরিব্রাজক জীবনে বেশ কয়েকবার নিজেই কুমারীপূজা করেছিলেন।

১৯০১ সাল। বেলুড় মঠে স্বামীজী হঠাৎ একদিন রাজা মহারাজকে ডেকে দুর্গাপূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কয়েকদিন আগে রাজা মহারাজও স্বপ্ন দেখেছিলেন 'মা দুর্গা আসছেন'। সেই থেকে রাজা মহারাজের মনে ভাবনা হয়েছিল, দুর্গাপূজা করলে কেমন হয়! কিন্তু প্রকাশ্যে একথা বলতে পারেননি। কারণ অর্থ কোথায়, কে করবে ব্যবস্থা! তাই যখন স্বামীজী বললেন, রাজা মহারাজও খুব খুশি হলেন। কুমারটুলিতে প্রতিমা খুঁজতে লোক পাঠানো হল। সেখানে তাঁরা একখানি মূর্তি পেলেন, সেও এক কাকতালীয় ব্যাপার। মূর্তিটি যারা অর্ডার দিয়েছিল, তারা অর্ডারের পরে আর কোনও যোগাযোগ করেনি। সেই প্রতিমাখানিই তখন নৌকায় করে বেলুড় মঠে আনা হল। স্বামীজী তাঁর প্রিয় বেলগাছের নিচে বসে দেবীর আবাহন করেছিলেন, 'গিরি গণেশ আমার শুভকারী' গানখানি গেয়ে। সে-পূজার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মানন্দজী, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল ছিলেন পূজক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন তন্ত্রধারক।

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পূর্বে স্বামীজী বিভিন্ন সময়ে যখন ভারত-পরিব্রাজন করেছিলেন তখন কয়েকবার কুমারীপূজা করেছেন। একবার গাজীপুরে, একবার কাশ্মীরে এবং একবার কন্যাকুমারীতে—এরকম দু-তিন বারের কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে বিশেষভাবে জানা যায়। কাশ্মীরে যে-বজরা বা নৌকাতে তিনি ছিলেন তারই মাঝির মেয়েকে স্বামীজী দূর থেকে মাতৃরূপা দেখলেন। তাঁর মনে বিশেষ ভাবের উদয় হল। তিনি

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ কুটির, আলমোড়া

বললেন, ''এই মেয়েটিকে আমি কুমারীপূজা করব।'' নিবেদিতা ও অন্যান্য আরও কয়েকজন সঙ্গে ছিলেন। স্বামীজী যখন বাইরে এলেন তখন সেখানে উপস্থিত স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা বললেন, ''আপনি একে কুমারীপূজা করবেন কী করে, এ তো মুসলিমের মেয়ে!'' স্বামীজী বললেন, ''তাতে কী! আমি তো সন্ন্যাসী, আমার কাছে তো জাতিভেদ নেই! আর প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যেই মা দুর্গা আছেন!'' এরপর ক্ষীরভবানী মায়ের মন্দিরে স্বামীজী মেয়েটিকে পূজা করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও কুমারীপূজা করেছিলেন।

১৮৯০ সালের জানুয়ারির শেষভাগে অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথমে গাজীপুরে স্বামীজী যে কুমারীপূজা করেছিলেন তার সঙ্গে পরবর্তী কালে এক সাধ্বীর পূত-জীবন ও আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটিরে বর্তমানে পূজিত মা দুর্গার পটের এক ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। ১৮৯০-এর জানুয়ারির শেষভাগে গাজীপুরে এসে পৌঁছলেন স্বামীজী। আতিথ্য গ্রহণ করলেন বাল্যসখা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে থাকাকালীন মণিকা নামে একটি মেয়েকে তিনি কুমারীপূজা করেছিলেন। মণিকার পিতা গগনচন্দ্র রায় ছিলেন স্বনামধন্য প্রবাসী বাঙালি। গাজীপুরের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। গগনচন্দ্রের বাড়িতে মাঝেমাঝেই ধর্মালোচনার আয়োজন হত এবং সেই সভায় সাধুসন্ত ও বিশিষ্টজনেরা নিমন্ত্রিত হতেন। স্বামীজীর আগমনের কথা জানতে পেরে গগনচন্দ্র একদিন সাগ্রহে ও যথাযথ সমাদরে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। সেদিন গগনবাবুর বাড়িতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অনলবর্ষী বক্তৃতা ও সংগীতে তাঁরা অভিভূত হয়েছিলেন। সভাশেষে স্বামীজী হঠাৎ দেখতে পেলেন গগনচন্দ্রের নয় বছরের কন্যাকে। স্নিগ্ধকান্তি কন্যাটির সৌন্দর্যে এক অসাধারণ উজ্জ্বলতা, তার আয়ত চোখদুটিও অস্বাভাবিক দীপ্তিময়। গগনচন্দ্র দেখলেন, স্বামীজী একদৃষ্টে তাঁর কন্যাটিকে দেখছেন। আনন্দে আপ্লুত গগনবাবু এগিয়ে গিয়ে বললেন, ''স্বামীজী, এটি আমার মেয়ে মণিকা। আপনি একে আশীর্বাদ করুন।'' স্বামীজী বললেন, ''এ-কন্যাকে আমি অনেক আগেই আশীর্বাদ করেছি। এখন একে মাতৃরূপে পূজা করতে চাই।''

গগনচন্দ্র বিস্ময়ে ও আনন্দে চমকে উঠলেন। স্বামীজী হেসে বললেন, ''আপনার কন্যাটি অত্যন্ত শুদ্ধসত্ত্ব। আমি দেখামাত্রই তাকে জগন্মাতাজ্ঞানে পূজা করার সংকল্প করেছি। আপনি পূজার আয়োজন করুন।''

আনন্দিত গগনচন্দ্র পরদিনই কুমারীপূজার আয়োজন করলেন। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক মণিকা পূজিতা হলেন জগন্মাতারূপে। পূজার শেষে অন্তরের প্রশান্তিতে স্বামীজী গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন সেদিন। সেদিনের সেই পূজা মণিকার অন্তরলোকে কতটুকু আলো ছড়িয়েছিল, তার পরিমাপ আমরা করতে পারি না। কিন্তু সেই নবমবর্ষীয়া বালিকা মণিকাই উত্তরকালে হয়েছিলেন সাধ্বী 'শ্রীযশোদা মায়ী।' তাঁকে আশ্রয় করে বহু মানুষ আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকিত হয়েছিলেন।

মণিকা দেবী (১৮৮২-১৯৪৪) শৈশব থেকেই অত্যন্ত সরলা ও ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে, যিনি ১৯২০ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হন। শাণ্ডিল্যগোত্রের ব্রাহ্মণ এই চক্রবর্তীরা ধনী ছিলেন, বেনারসে তাঁদের তিনতলা বাড়ি ছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও জ্ঞানেন্দ্র বেনারসের মিশনারি স্কুল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এলাহাবাদের মুইর সেন্ট্রাল কলেজে অধ্যয়ন করে এম এ এবং এল এল বি

ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি বেরিলি কলেজ, মুইর সেন্ট্রাল কলেজ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনা করেন। তিনি কোর্টে আইন প্র্যাকটিসও করেছিলেন। ইংরেজ ভাবধারার সঙ্গে তিনি যেমন স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তেমনই হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থেও তাঁর প্রভূত পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্মের আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করতেন। সেকারণে তিনি ইংরেজ ও ভারতীয় সকলের কাছেই সমানভাবে সম্মানিত হতেন। প্রতিদিন ভোর তিনটে থেকে ছটা পর্যন্ত নিয়মিত জপধ্যান করতেন তিনি। লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ায় বেশিরভাগ সময় তাঁরা লক্ষ্ণৌতেই থাকতেন। ১৮৯৩ সালে অ্যানি বেসান্ত এবং অন্যান্যদের সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথ শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সেখানে সবার সঙ্গে তিনিও স্বামীজীর বিশ্বজয়ী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং মণিকা দেবীকে তা পত্রে জানিয়েছিলেন।

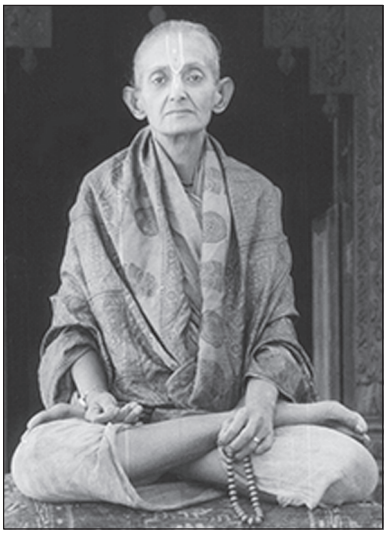
যশোদা মায়ী

তাঁদের চার সন্তান ছিল। এছাড়াও তাঁরা চল্লিশটির মতো শিশুকে লালন-পালন ও লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছিলেন। শৈশব থেকেই মণিকা পার্থিব জীবনের প্রতি উদাসীন ছিলেন। ধার্মিক স্বামীর সংস্পর্শে তাঁর ঈশ্বরলাভের বাসনা দিনদিন তীব্রতর হতে থাকে। তাঁদের গৃহই যেন একটি আশ্রম হয়ে উঠেছিল। সেখানে অনেকেই আসতেন যাঁদের মধ্যে অন্যতম লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোনাল্ড নিক্সন (১৮৯৮-১৯৬৫), যিনি পরবর্তী কালে যশোদা মায়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম' নাম গ্রহণ করেন এবং আজীবন তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

চক্রবর্তী দম্পতির এক কন্যার বিবাহ ঠিক হয়েছিল এক আই সি এস অফিসারের সঙ্গে। সেকালে সাধারণত বিবাহের আগে মেয়েদের কিছু বলা হত না, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কিন্তু বিবাহ স্থির হয়েছে জানতে পেরে সে কিছুতেই বিবাহে রাজি হল না। অগত্যা তাঁদের এক আত্মীয়-কন্যার সঙ্গে সেই আই সি এস অফিসারের বিবাহ দিয়ে সম্মানরক্ষা করেছিলেন।

মণিকা দেবীর মনে আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের বাসনা বরাবরই ছিল। দিনের অনেকটা সময় তিনি সাধনভজনেই কাটাতেন। একদিন তিনি স্বামীকে জানান, তিনি আর সংসারে থাকবেন না; সংসার থেকে দূরে গিয়ে বাকি জীবন সাধনভজনেই কাটাবেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, বারাণসীর বাড়ির ওপরতলায় নিজের মতো থেকে মণিকা দেবী সাধনভজন করুন। প্রয়োজনে এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে যেন স্থানটি সবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং কেউ সেখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে! আশ্রমিক জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব সেখানেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু, মণিকা দেবী সিদ্ধান্তে অটল। দিনেদিনে তাঁর ইচ্ছা ও মানসিক জোর আরও প্রবল হল। মণিকা দেবী তাঁর স্বামীকে আবারও সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা জানালেন। অবশেষে ১৯২৮ সালে বৃন্দাবনে তাঁর আনুষ্ঠানিক দীক্ষা অনুষ্ঠিত হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে। মণিকা

দেবী মুণ্ডন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, নাম হল ‘শ্রীযশোদা মায়ী’। ঠিক হল তিনি বৃন্দাবনেই থাকবেন। তাঁদের ছোট মেয়ে অর্পিতা, যিনি ‘মতি রানি’ নামে পরবর্তীতে সমধিক পরিচিতা হন, তিনিও মায়ের সঙ্গেই সংসার ছেড়ে বেরোলেন। প্রথমে তাঁরা বৃন্দাবনে ছিলেন। সেখানকার প্রচণ্ড গরম যশোদা মায়ীর সহ্য না হওয়ায় তাঁরা চলে এলেন আলমোড়ায়।

হিমালয়ের কুমায়ুন অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে আলমোড়া। জ্ঞানেন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় যশোদা মায়ী এবং তাঁর সঙ্গীরা লালা বদরি শাহের একটি বাড়িতে ভাড়া ছিলেন, যেখানে একসময় স্বামী তুরীয়ানন্দজী ও স্বামী শিবানন্দজী কিছুদিন তপস্যা করেছেন। স্থানীয় মানুষেরা বলেন, বাড়িতে চাকর-বাকর, দারোয়ান সবকিছুরই এমন ব্যবস্থা করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু যে, মনে হত কোনও রানি-মহারানি আছেন। কিন্তু বাড়ির ভেতরে যশোদা মায়ী অতি সাধারণ সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করতেন। ইংরেজ ভক্ত ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেম’ (রোনাল্ড নিক্সন), যিনি যশোদা মায়ীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ওই বাড়িতে থাকতেন এবং তাঁর দেখাশোনা করতেন। বাড়িটিতে ধীরে ধীরে ভক্তদের ভিড় বাড়তে থাকে। এরপর তাঁরা এখান থেকে আরও ত্রিশ- পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে (পিথোরাগড়ের রাস্তায়) মিরতোলায় স্থায়ী আশ্রম গড়ে তোলেন।

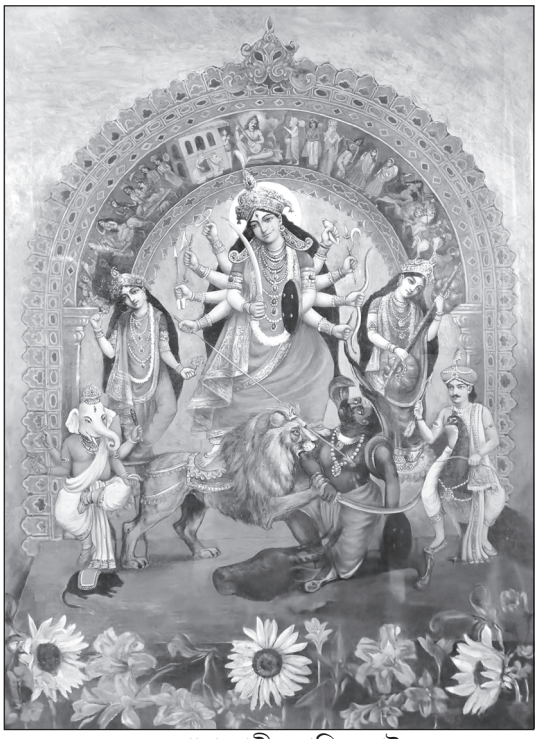

যশোদা মায়ীর পূজিত পট

যশোদা মায়ীর কাছে মা দুর্গার একখানি অয়েল-পেন্টিং ছিল, তাতেই নিজের ঘরে তিনি পূজা করতেন। সেবকদের বলে রেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর ছবিটি যেন রামকৃষ্ণ কুটির, আলমোড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালে মিরতোলা আশ্রমেই তিনি দেহত্যাগ করেন। এরপর থেকে ছবিটি রামকৃষ্ণ কুটিরের মন্দিরে সংরক্ষিত আছে এবং এই ছবিতেই নবরাত্রি দুর্গাপূজা হয়ে আসছে সেই থেকে।

ইতোমধ্যে দীর্ঘ সময় পার হয়েছে, উল্লিখিত মা দুর্গার ছবিখানি বিবর্ণ না হলেও তাতে সময়ের ছাপ পড়েছিল। তাই দুবছর আগে রি-ইন্সটেট করার জন্য আমি ছবিটির ফ্রেম খুলেছিলাম। তখন দেখি, ডি. বোস নামে জনৈক শিল্পী ১৯২৩ সালে ছবিখানি এঁকেছিলেন। যশোদা মায়ী নিজেও ভাল ছবি আঁকতেন। তাই আমাদের অনেকেরই ধারণা ছিল এটি তাঁরই আঁকা। তবে তাঁর আঁকা কিছু ছবি ভক্তদের বাড়িতে এবং মিরতোলা আশ্রমে আছে।

মা দুর্গার এই ছবিটি যে দেখে সে-ই অভিভূত হয়, এত সুন্দর এত জীবন্ত! এই পটের সঙ্গে যেন স্বামীজীও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন। যশোদা মায়ীর পূজিত দুর্গার পট ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথাই আমাদের স্মরণ করায়।